অষ্টম অধ্যায়

নাথসাহিত্য

১. সূচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানত বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব—এগুলি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়। এরও পিছনে আছে বিশাল আর্যেতর সংস্কৃতি। একদা প্রায় সারা ভারতবর্ষেই দ্রাবিড় ও নিষাদ সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আর্যরা এলেন তার অনেক পরে। এই মিশ্র ধর্মচেতনা সারা ভারতবর্ষকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। শৈব নাথধর্মমতও বিচিত্র ধর্মবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশে শৈব নাথ-সম্প্রদায় এখনও আছে। যুগী নামেই এই সম্প্রদায় সাধারণত পরিচিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজনেতারা বলেন, আসলে তাঁরা 'যোগী', কিন্তু শব্দটি ভ্রষ্ট হয়ে 'যুগী' এই অপশব্দে পরিণত হয়েছে। দশম শতাব্দীর দিকে সারা উত্তর-ভারতে গোরক্ষ-পন্থী নাথ-সম্প্রদায় ছিল, পশ্চিম-ভারতেও এঁদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশেও এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের সাধনভজন করে আসছিলেন এবং এখনও নানা শাখা-প্রশাখায় এঁরা বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন। এঁদের ধর্মকর্ম ও আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে অনেক ছড়াপাঁচালি, লোকগীতি, আখ্যানকাব্য পাওয়া গেছে, সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে যার মূল্য স্বীকার করতে হবে। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করতেন, এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি ছড়াগান ও আখ্যানকাব্য বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব অর্থাৎ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর দিকেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই রচনাগুলি বিশেষ প্রাচীন নয়। ছড়াগুলি উত্তর-বঙ্গের কৃষকদের মুখ থেকে শুনে লিখে নেওয়া হয়েছে—কাজেই এগুলি হাল আমলের। 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন'-এর পুঁথিও দু-এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে পুরাতন নয়। কাজেই প্রাপ্ত নাথসাহিত্যকে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে কোনো-না-কোনো প্রকার নাথসাহিত্য রচিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তুর্কি অভিযানের পর প্রায় দুশো বছর ধরে এ-দেশে যে ভয়াবহ অরাজকতা চলেছিল, তার বন্যাধারায় বোধ হয় এই জাতীয় সাহিত্যের নিদর্শন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। চর্যাগীতিকার পুঁথি নেপাল থেকে পাওয়া গেছে, এ পুঁথি বাংলায় থাকলে আমরা পেতাম বলে মনে হয় না। এ-ও সেই অরাজকতার আঘাতে বিলুপ্ত হয়ে যেত। যাই হোক, নাথসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার আগে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলে নেওয়া যাক।

একদা ভারতের কোনো কোনো দার্শনিকগোষ্ঠী জড়দেহকে মুক্তির বাধা না বলে সোপান হিসেবেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা নানা ধরনের যৌগিক, তান্ত্রিক, রাসায়নিক, আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত ভিষগ্‌বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ক করে তার সাহায্যে মোক্ষ-মুক্তি-নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন। এঁরা দর্শন হিসেবে পতঞ্জলির যোগদর্শন এবং ক্রিয়াকর্ম

হিসেবে তন্ত্র ও হঠযোগের বিশেষ সাহায্য নিয়ে পিণ্ডদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এক কথায় এঁদের যোগীসম্প্রদায় বলে, কারণ এঁদের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি পতঞ্জলির যোগদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এঁরা 'কায়াসাধনা' করতেন, অর্থাৎ পিণ্ডদেহ বা ভূতকায়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কেউ কেউ মনে করতেন, এই সাধনার দ্বারা ভঙ্গুর জীবনকে "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ" করা যায়।

যোগের দ্বারা প্রাণায়ামাদির সাহায্যে এঁরা নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। পূরক-কুম্ভক-রেচক শীর্ষক বায়ু বশীভূত করে এঁরা মোক্ষলাভের প্রথম সোপান অতিক্রম করতেন। তারপর তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব অবলম্বনে নিজ দেহমধ্যে শিরঃস্থিত সহস্রদলযুক্ত পদ্মসহস্রারে, শিবশক্তির মিলনসম্ভূত দিব্যানুভূতি লাভ করতেন। তখন অবশ্য পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ অপার্থিব দিব্যদেহে পরিণত হত। এঁরা মূলত আত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী ততটা নন। সাধনপ্রক্রিয়ার দ্বারা নিজের মোক্ষ লাভ—এই হল এঁদের সাধনা। শিব এঁদের আদিগুরু—তিনিই আদিনাথ। তাঁর শিষ্য মীননাথ, মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। এই গোরক্ষনাথের পবিত্র জীবন-কাহিনী নিয়ে সারা ভারতেই কত গান-গল্প রচিত হয়েছে। ইনি নিজের গুরু মীননাথকে বুদ্ধিভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করে স্মরণীয় হয়েছেন। শিব আদিনাথ হলেও চরিত্রগৌরবে গোরক্ষনাথ অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন, মানুষ হয়ে মাহাত্ম্যে দেবতাকে-ও ছাড়িয়ে গেছেন। তাই নাথপন্থীরা কোনো কোনো প্রদেশে 'গোরক্ষপন্থী' নামেও পরিচিত।

নাথধর্মে ন-জন গুরুর কথা জানা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরাও তাঁদের চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সঙ্গে এই ন-জন নাথেরও পূজা করতেন। চর্যাগীতিকার পদে ও টীকায় নাথধর্ম ও নাথগুরুর উল্লেখ আছে। নাথধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে এই ন-জন নাথের নামধাম থাকলেও এক গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে অন্য গ্রন্থের বর্ণনার রেখায় মিল নেই। মোটামুটি তাঁদের নাম-ধাম এই রকম: পূর্বে গোরক্ষনাথ, উত্তরাপথে জলন্ধর (জ্বালামুখী তীর্থ), দক্ষিণে নাগার্জুন (গোদাবরী নদীর কাছে), পশ্চিমে দত্তাত্রেয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবদত্ত, উত্তর-পশ্চিমে জড়ভরত, কুরুক্ষেত্র ও মধ্যদেশে আদিনাথ এবং দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রোপকূলে মৎস্যেন্দ্রনাথ—এই হচ্ছেন ন-জন নাথগুরু। মারাঠি কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে, আদিনাথ শিবের কাছে 'মহাজ্ঞান' (অর্থাৎ পিণ্ডদেহে মোক্ষ লাভ বা অমরত্ব লাভ) শিক্ষা করেন শিব-ঘরণী পার্বতী, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও জালন্ধরিপাদ। মৎস্যেন্দ্রের (বাংলাদেশের মীননাথ) দু-জন শিষ্য—গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ। জালন্ধরের দুই শিষ্য—কানিফা (বাংলার কানুপা) ও ময়নামতী। গোরক্ষনাথের দুই শিষ্য—গৈনীনাথ ও চর্পটিনাথ। এঁদেরও নানা শিষ্যপরম্পরা আছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় তার ততটা প্রয়োজন নেই। বাংলা সাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মৎস্যেন্দ্রনাথ অর্থাৎ মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ অর্থাৎ হাড়িপা, রানী ময়নামতী, কানুপা ময়নামতীর একমাত্র সন্তান গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে নিয়ে কিছু কিছু ছড়া-পাঁচালি ও কাব্যকাহিনী লেখা হয়েছে। আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু এইটুকু। এর মধ্যে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীকে কেন্দ্র করে একাধিক পুঁথি লেখা হয়েছে। ময়নামতী ও তাঁর ছেলে গোপীচন্দ্রের বিষয়ে বেশির ভাগ মৌখিক ছড়া পাওয়া গেছে। আলোচনার সুবিধের জন্য এই নাথসাহিত্যকে দুটি বৃত্তে ভাগ করা যায় : ১. গোরক্ষনাথ বৃত্ত, ২. ময়নামতী-গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) বৃত্ত। এইভাবে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

২. গোরক্ষনাথ বৃত্ত

গোরক্ষনাথের মহিমাবিষয়ক কাহিনী এবং ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের আখ্যান নাথসাহিত্যের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত বাংলার বাইরেও নাথসাহিত্য প্রধানত এই দুই শাখায় বিভক্ত। অবশ্য নাথধর্ম, দর্শন ও তত্ত্বসংক্রান্ত কিছু কিছু রহস্যবাদী কবিতা ও গান বাংলা ও বাংলার বাইরে প্রচলিত আছে। কিন্তু কাহিনী বলতে ঐ দুটি গল্পকথাই জনসমাজে প্রচারিত হয়েছে।

গোরক্ষনাথকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলতে চান। অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে যে-কোনো সময়ে তিনি মর্ত্যদেহ ধারণ করে বর্তমান ছিলেন, এমন কথা শোনা যায়। ভারতের নানা অঞ্চল তাঁর আবির্ভাব স্থান বলে কল্পিত হয়েছে। এবিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। কারণ নানাপ্রকার জনশ্রুতি এবং পরোক্ষ উল্লেখ ভিন্ন তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাসের দিক থেকে কোনো সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায় না। যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা মনে করেন গোরক্ষনাথ পেশোয়ারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যোগী-সম্প্রদায় অর্থাৎ গোরক্ষপন্থীরা মনে করেন, তিনি পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন, পরে বিহারের গোরক্ষপুরে বাস করেছিলেন। এই সমস্ত তথ্য থেকে মনে হয়, তিনি উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম-ভারতে কোনো-না-কোনো সময়ে মর্ত্যশরীরে বর্তমান ছিলেন। সম্ভবত তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মতো বহু স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর নানা অঞ্চলের শিষ্যেরা গুরুকে তাঁদের অঞ্চলে আবির্ভূত বলে দাবি করেছিলেন। যাই হোক, তাঁকে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী মনে হচ্ছে না, খুব সম্ভব তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি—এর বেশি আর বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তিকালে শিব-মৎস্যেন্দ্রনাথের পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে তাঁর কাহিনী জুড়ে গিয়ে তিনি পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

গোরক্ষনাথকে ঘিরে নানা প্রদেশেই অনেক রকমের গল্পের সৃষ্টি হয়েছে, আমরা শুধু বাংলাদেশের গোরক্ষনাথ-কাহিনীরই আলোচনা করব। গোরক্ষনাথ কর্তৃক পথভ্রষ্ট গুরু মীননাথকে উদ্ধার করার কাহিনী নিয়ে এ-দেশে দু-রকমের বই লেখা হয়েছিল, একটির নাম 'গোরক্ষবিজয়, বা 'গোর্খবিজয়', আর একটির নাম 'মীনচেতন'। দুটির বিষয় একই। গোরক্ষনাথের বিজয়কাহিনী বা গুরু মীননাথকে চেতন করা অর্থাৎ উদ্ধারের গল্পই পুঁথি দু-খানিতে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত গোরক্ষমহিমা-বিষয়ে তিনখানি পুঁথি ছাপা হয়েছে, ১. ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন', ২. মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়' ৩. ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের 'গোর্খবিজয়'। এখন মুস্কিল হয়েছে—এই তিনখানি পুঁথি পৃথক কাব্য কি না, এবং এর রচনাকার বলে উল্লিখিত শ্যামদাস সেন, শেখ ফয়জুল্লা ও ভীমসেন তিনজনই পৃথক কবি কি না। এই তিনখানির মধ্যে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় (১৯১৫ সাল), তারপরে প্রকাশিত হয় আবদুল করিম সাহেব সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়' (১৯১৭ সাল), সবশেষে প্রকাশিত হয় ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের 'গোর্খবিজয়' (১৯৪১)। নলিনীকান্তের সম্পাদিত 'মীনচেতন' কাব্যের মাত্র দু' জায়গায় শ্যামদাসের ভণিতা আছে, আর কোথাও এই কবি বা অন্য কারও ভণিতা নেই। তার থেকে ড. ভট্টশালী মনে করেন, কবির নাম শ্যামদাস সেন। পুঁথিটিতে 'মীনচেতন' নাম আছে বলে সম্পাদক সেই নামই বহাল রেখেছেন। এর

কিছু পরে করিম সাহেব আটখানি পুঁথি অবলম্বনে 'গোরক্ষবিজয়' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তিনি পুঁথিগুলিতে কবীন্দ্রদাস, শেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিতা পেয়েছেন। এর মধ্যে যেটি প্রাচীনতর ও নির্ভরযোগ্য তাতে পুঁথির নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—'ইতি মীননাথ চৈতন্য গোখবিজয় সমাপ্তা"। কোনো কোনো পুঁথিতে শুধু 'গোখ (গোরক্ষ, গোর্খ) বিজয়' আছে। তাই করিম সাহেব অনুমান করেন মূল কাব্যটির নাম বোধ হয় 'মীনচেতন-গোরক্ষবিজয়' বা 'গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন' ছিল। পরে নানা লিপিকারের হাতে পড়ে গল্প-আখ্যায়িকা কখনও 'গোরক্ষবিজয়' কখনও-বা 'মীনচেতন' নামে উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য নলিনীকান্ত সম্পাদিত 'মীনচেতন' এবং করিম সাহেব সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনী অধিকাংশ স্থলেই একরকম, ভাষাও তাই। সুতরাং করিম সাহেবের অনুমান অনেকটা ঠিক।

এখন দেখা যাক গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনের প্রকৃত রচনাকার কে—এক, না একাধিক। করিম সাহেবের মতে ফয়জুল্লাই প্রকৃত রচনাকার, অন্য সকলে গায়েন মাত্র। ড. পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন যে, ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন বা ভীমসেন—কেউ-ই কাব্যের রচনাকার নন—এঁরা গোরক্ষ-গীতিকার গায়ক মাত্র। দীনেশচন্দ্রও মনে করতেন, শেখ ফয়জুল্লা মূল রচনাকার নন—তাঁর মতে ফয়জুল্লাও সংকলক। আবার কেউ কেউ সমস্যার জড় মেটাবার জন্য বলেছেন যে, ভীমসেন, শ্যামদাস এবং ফয়জুল্লা—তিনজনেই গোরক্ষবিজয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। অনেকে ভীমসেনকেই প্রাচীনতম রচনাকার, আর অন্য দু-জনকে পরবর্তী কবি বলতে চান। যোগী-সম্প্রদায়ের গায়কেরা এই তিনজনের রচনাকে একসঙ্গে গ্রথিত করে গান করে থাকেন। এসব বিষয়ে সেকালে অর্ধশিক্ষিত উপধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক কালের মতো সতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ প্রচলিত ছিল না। এ সমস্ত কাহিনী ছিল মূলত ধর্মীয় গানের অঙ্গ। সাধক ও ভক্তের দল গেয় বস্তুটার প্রতি যতটা অনুরক্ত ছিলেন গানের রচনাকার সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিলেন না। তাছাড়া এ ধরনের গান অনেকটাই ছিল মৌখিক। পরে কিছু কবিত্বশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত গান-পাঁচালি-ছড়াকে সংগতিপূর্ণ কাহিনীর আকার দিয়েছেন। সুতরাং কে যে সমস্ত গানের প্রকৃত রচয়িতা তা বলা সহজ নয়। আমাদের অনুমান শেখ ফয়জুল্লা এবং ভীমসেনই (এঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র) ছড়া-পাঁচালিগুলিকে মোটামুটি আখ্যানকাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। রচনাদি দেখে মনে হচ্ছে, এগুলি বেশি পুরাতন নয়, সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীরই হওয়া সম্ভব। এখানে গোরক্ষবিজয়-মীনচতেনের গল্পটি সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে।

এই আখ্যানে নাথ সম্প্রদায়ের সর্বজনমান্য যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথের অদ্ভুত মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কামক্রোধবিজয়ী সাত্ত্বিক পুরুষ গোরক্ষনাথ কীভাবে তাঁর পথভ্রষ্ট গুরুকে নারীদের কবল থেকে উদ্ধার করলেন—এ-কাব্যের মূল কাহিনীতে তারই পরিচয় আছে। দেখা যাচ্ছে, আদিপুরুষ নিরঞ্জনের মুখ থেকে শিব, নাভি থেকে মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদ (বা জালন্ধরিনাথ), কান থেকে কানিফা (কানুপা) এবং জটা থেকে গোরক্ষ (গোর্খ)-নাথের জন্ম হল। শিব জন্মালেন আদিপুরুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ থেকে, আর গোরক্ষনাথ জন্মালেন উত্তমাঙ্গের সন্ন্যাসের চিহ্ন জটা থেকে। কাজেই গোরক্ষ কামক্রোধবিজয়ী সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে জন্মালেন গৌরী। নিরঞ্জনের নির্দেশে শিব গৌরীকে বিয়ে করলেন। এর পরে মীননাথ ও হাড়িপা (জালন্ধরিপাদ) মহাদেবের শিষ্য হলেন, গোরক্ষনাথ মীননাথকে গুরু বলে বরণ করলেন এবং কানুপা হলেন হাড়িপার শিষ্য। তারপর তাঁরা যোগধ্যানে নিমগ্ন হলেন। একদিন মহাদেব গৌরীকে সুগোপনে যখন গুহ্যাতিগুহ্য "মহাজ্ঞান" তত্ত্ব

বোঝাচ্ছিলেন তখন লোভী মীননাথ মাছের রূপ ধরে তা শুনে নেন। তাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন যে, মীননাথ যা শুনেছেন তা সব ভুলে যাবেন। এরপর একদিন মহাদেবের শিষ্যদের নৈতিক বল পরীক্ষার জন্য পার্বতী তাঁদের নিমন্ত্রণ করে অন্ন পরিবেশন করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত সিদ্ধা তাঁর ভুবনমোহন লাবণ্য দেখে মনে মনে কামের বশীভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ তাঁকে মাতৃভাবে দেখলেন, এবং মনে মনে বললেন, আহা, ইনি যদি আমার মা হোতেন, তা হলে এঁর কোলে শিশু হয়ে দুধ খেতাম। পার্বতী অন্য শিষ্যদের চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য অভিশাপ দিলেন, কিন্তু তিনি গোরক্ষনাথকে আরও পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন এবং পথের একপাশে বিবস্ত্রা অবস্থায় শুয়ে যতিশ্রেষ্ঠের মনে বিকার সৃষ্টি করতে চাইলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ এতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, বরং এই অনুচিত কর্মের জন্য দেবীকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেললেন। যাই হোক, শিব গোরক্ষনাথকে বিয়ে করে সংসারী হতে বললেন। বাধ্য হয়ে গোরক্ষনাথ এক রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করলেন না, কারণ তিনি যোগমার্গের সাধক, এ পথ তাঁর নয়। স্ত্রী এতে দুঃখ পেলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তাঁর স্ত্রী পুত্রসন্তান পাবেন—এর নাম কপটীনাথ। অতঃপর স্ত্রীপুত্রাদি ছেড়ে যোগী পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে কানুপার কাছে শুনলেন, তাঁর গুরু মীননাথ কদলী (অর্থাৎ স্ত্রীলোক) রাজ্যে গিয়ে জপধ্যানাদি বিসর্জন দিয়ে ভোগসুখে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর একটি ছেলেও হয়েছে, তার নাম বিন্দুনাথ। তখন গোরক্ষ উপযুক্ত শিষ্যের কাজ করবার জন্য ব্যস্ত হলেন এবং গুরুকে সংসারের মোহজাল থেকে উদ্ধার করে আবার যোগসন্ন্যাসের পথে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তার জন্য তিনি সুরক্ষিত কদলীর পুরীতে গিয়ে নানা কৌশলে নর্তকীর বেশে মীননাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং নৃত্যগীতের ছলে গুরুকে বিস্মৃত 'মহাজ্ঞান' স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। গুরু সবই বুঝতে পারলেন বটে, কিন্তু সহজে কি স্ত্রীপুত্রাদি ও সংসার বাঁধন কাটা যায়? গোরক্ষনাথ নিরুপায় হয়ে গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে মেরে ফেলে গুরুর মোহভঙ্গের চেষ্টা করলেন। কদলী রমণীরা কলরব করতে লাগল। তখন গোরক্ষনাথ বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু নারীদের বাদুড় করে উড়িয়ে দিলেন। বাদুড়ের দল উড়ে চলে গেল কোথায় কে জানে! মীননাথের মোহ দূর হল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, যেন স্বপ্নভঙ্গের পর, শিষ্যের হাত ধরে আবার সন্ন্যাসের পথে বার হলেন, পুত্র বিন্দুনাথও সন্ন্যাস নিয়ে তাঁদের অনুসরণ করল।

কাহিনীটি কিন্তু নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এতে একদিকে সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথের মায়ামোহবর্জিত নিঃস্পৃহ বৈরাগী মন এবং কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা চমৎকার ফুটে উঠেছে, আর একদিকে মীননাথের সাংসারিক মায়ামুগ্ধ বিড়ম্বিত চরিত্রটিও সুপরিকল্পিত হয়েছে। দেহের ওপরে আত্মার জয়ঘোষণা করা এই সমস্ত নাথপন্থী যোগী-কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—সেই আদর্শটি গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কেউ কেউ এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে উচ্চতম কাব্যধর্ম উপলব্ধি করেছেন—কেউ কেউ একে নাটকীয় ও মহাকাব্য ধরনের রচনা বলতেও কুণ্ঠিত হননি। এ সমস্ত উচ্ছ্বাস নিতান্তই ভক্তির আবেগমাত্র। কাহিনীটি এবং চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য বটে, এবং উপযুক্ত কবির হাতে পড়লে এ ধরনের কাব্য মহাকাব্যের উচ্চতা লাভ করতেও পারত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে স্বল্পপ্রতিভাধর অর্ধশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের দল এগুলি লিখত, শ্রোতারা প্রায়ই ছিল নিরক্ষর এবং পুঁথির জ্ঞান বর্জিত। সুতরাং এ ধরনের কাহিনী লোকসাহিত্যের দিকে যতটা অগ্রসর হয়েছে, মার্জিত সাহিত্যের দিকে ততটা যেতে

পারেনি। সুতরাং একে উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত বলে পুলকিত হবার কারণ নেই। তবে এঁরা মূলত ছিলেন নিরীশ্বরবাদী, নিজের আত্মার মুক্তি-মোক্ষ নিজের সাধনার দ্বারাই সম্ভব—এঁরা ছিলেন এই মতের প্রচারক। দেবদেবীর প্রতি এঁদের যে খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল না, তার প্রমাণ শিব-দুর্গার চরিত্র। গোরক্ষনাথের কাছে দুর্গাকে কি রকম নাকাল হতে হয়েছিল, তা কাব্যটি পড়লেই বোঝা যাবে। এঁরা আকার-বিশিষ্ট ঈশ্বর-চেতনায় উদাসীন বা বিমুখ ছিলেন বলে মুসলমান সাধকেরাও এই দলে যোগ দিতে বিশেষ কোনো মানসিক বাধা পাননি। এই কাব্যের সর্বাধিক পরিচিত কবিও মুসলমান—শেখ ফয়জুল্লা, যাঁর কথা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। এখনও এই যুগী-সম্প্রদায় (বা যোগীসম্প্রদায়) নীরবে তাঁদের সাধনভজন করে যাচ্ছেন, তাঁদের সম্প্রদায়ে গোরক্ষমহিমা সুবিদিত। মধ্যযুগে সারা বাংলাদেশে এঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল।

৩. ময়নামতী-গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) বৃত্ত

বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষত উত্তরবঙ্গের কৃষকসমাজে রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর মাতা রানী ময়নামতীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী ছড়া-পাঁচালি আকারে এখনও প্রচলিত আছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের নানা প্রদেশেও রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-বিষয়ক সকরুণ কাহিনী গড়ে উঠেছে, কোনো কোনো প্রদেশের লোকনাট্যেও এ কাহিনীর প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশে মৌখিক ছড়া-পাঁচালি ছাড়াও দু-একটি পুঁথিও পাওয়া গেছে। অনেকে এ কাহিনীর বাস্তব সত্তা ও ঐতিহাসিকতা নিয়ে অনেক অনাবশ্যক গবেষণা করেছেন। এ ধরনের লোক-কাহিনীর পিছনে সর্বদা ইতিহাসের লেজুড় খুঁজতে গেলে বিড়ম্বিত হতে হবে। তবে গবেষকদের চেষ্টা ও চিন্তার বিরাম নেই। কেউ কেউ বলেন, বাংলাদেশ থেকেই মূল কাহিনীটি বিহার, পঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে গিয়েছিল। বাংলার কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুলের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী হলেন রানী ময়নামতী এবং পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র। এই কাহিনীর কেন্দ্র কিন্তু রংপুর। নেপালে প্রাপ্ত 'গোপীচন্দ্র নাটকে' গোপীচন্দ্রকে বঙ্গের রাজা বলা হয়েছে। প্রাচীন কবি মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবতে'ও গোপীচন্দ্র বাংলার রাজা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। গুজরাটি উপাখ্যানে গোপীচন্দ্রের পিতা তিলকচন্দ্রকে (মানিকচন্দ্র নন) বাংলার রাজা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ময়ূরভঞ্জ থেকে ওড়িয়া ভাষায় রচিত গোপীচন্দ্র-সংক্রান্ত যে কাহিনী পাওয়া গেছে, তাতেও তাঁকে 'বঙ্গের রায়' বলা হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এ কাহিনীর উৎপত্তিস্থান হচ্ছে বাংলাদেশে, আর এ-দেশ থেকেই কাহিনীটি অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করেছে। কাহিনীটি নাথ-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এর জড় পূর্বতন কাহিনী 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে নিহিত আছে।

'গোরক্ষবিজয়ে' দেখানো হয়েছে, একমাত্র গোরক্ষনাথ ব্যতীত অন্য নাথ আচার্যেরা দেবী দুর্গাকে দেখে ক্ষণকালের জন্য কামের বশীভূত হয়েছিলেন এবং দেবী তার জন্য তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপাকে তিনি অভিশাপ দিলেন, মেহারকুলের রানী ময়নামতীর কাছে গিয়ে নীচ কর্ম করতে হবে। তাঁর সঙ্গে ময়নামতীর সম্পর্ক গুরুভাই-ভগিনীর মতো, কারণ তাঁরা দুজনেই গোরক্ষনাথের শিষ্য। অভিশাপের ফলে জালন্ধরি বা হাড়িপা ময়নামতীর রাজ্যে গিয়ে নীচ হাড়ীর কর্ম অবলম্বন করলেন। কানুপাকে দুর্গা অভিশাপ

দিয়েছিলেন, বিমাতার প্রতি আকর্ষণের হেতু তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। কানুপা-বিমাতা-সংক্রান্ত কোনো পালা বা পাঁচালি বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। বাংলার বাইরে কানুপার ঐ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে।

রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণই হচ্ছে গোপীচন্দ্রের পাঁচালির মূল বিষয়। রানী ময়নামতী অদ্ভুত শক্তি 'মহাজ্ঞানে'র অধিকারিণী ছিলেন। তিনি সেই বিদ্যার প্রভাবে দেখলেন যে, তাঁর স্বামী রাজা মানিকচন্দ্রের শীঘ্র মৃত্যু হবে। তাঁকে দীর্ঘায়ু দেবার জন্য রানী স্বামীকে তাঁর কাছ থেকে 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা করতে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা পৌরুষে ঘা লাগবে বলে স্ত্রীর কাছ থেকে 'মহাজ্ঞান' নিতে অস্বীকার করলেন। ফলে তিনি যমদূতের বশীভূত হয়ে মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করলেন। ময়না যমদূতের সঙ্গে দারুণ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েও লুপ্ত-আয়ু স্বামীকে বাঁচাতে পারলেন না। স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁর গোপীচন্দ্র নামে একটি পুত্র হল। গোপীচন্দ্র ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ময়নামতী পুত্রকে অদুনা-পদুনা নাম্নী দুই রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন—এ দু-জন কিন্তু পরস্পরের ভগিনী। অতঃপর ময়নামতী দেখলেন, তাঁর সন্তানেরও তাঁর স্বামীর মতো অকালমৃত্যু হবে। হাড়িপার কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে কিছুকাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজক না হলে তাকে কেউ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তরুণ যৌবনে স্ত্রীদের ছেড়ে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, অদুনা-পদুনাও গোপনে শাশুড়ির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। স্ত্রীদের প্ররোচনায় গোপীচন্দ্র মাতৃচরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করতে কুণ্ঠিত হলেন না, হাড়িসিদ্ধা-জালন্ধরিপাদকে জড়িয়ে তিনি প্রকাশ্যেই মায়ের বিরুদ্ধে অসতীত্বের অভিযোগ আনলেন। তখন নিজেকে নিষ্কলঙ্ক সতী প্রমাণের জন্য ময়নামতী বাধ্য হয়ে ছেলের কাছে সুকঠোর পরীক্ষা দিলেন। অতঃপর গোপীচন্দ্রের অভিযোগ, অসম্মতি ও প্রতিবাদ আর টিকল না। তাঁকে মায়ের নির্দেশ মতো হাড়িসিদ্ধার কাছে মন্ত্র নিয়ে মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী সাজতে হল। হাড়িসিদ্ধা তাঁকে হীরানটীর বাড়িতে বাঁধা দিয়ে চলে এলেন। বহু দুঃখকষ্টে গোপীচন্দ্রের দিন কাটতে লাগল। অবশেষে সন্ন্যাসের কাল অবসান হলে হীরানটীর কবল থেকে তাঁকে হাড়িসিদ্ধা উদ্ধার করলেন এবং আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান শেখালেন। পরে সন্ন্যাসী গোপীচন্দ্র গৃহী হয়ে দুই স্ত্রীকে নিয়ে মহাসুখে রাজত্ব করতে লাগলেন, মায়ের উপদেশে সন্ন্যাস নেবার ফলে তাঁর আর অকালমৃত্যু হল না। এই কাহিনী রংপুরের কৃষকসমাজে কতকটা এই আকারে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু এই কাহিনীর একটি পুঁথিগত পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তাতে এর পরিণাম অন্য ধরনের।

এই পুঁথির নাম 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'। এতে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুর-মাহ্‌মুদ প্রভৃতি কবির ভণিতা পাওয়া যায়। এর ভাষা মার্জিত, বর্ণনার মধ্যেও গ্রন্থননৈপুণ্যের আভাস আছে। মনে হয় কৃষকসমাজে উপরের কাহিনীটি প্রচলিত ছিল। পরবর্তিকালে কোনো কোনো হিন্দু-মুসলমান কবি সেই লোকগাথাটিকে মেজেঘষে একটি আখ্যানকাব্যের রূপ দিয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, গোবিন্দচন্দ্র বারো বছর সন্ন্যাসজীবন যাপনের পর দেশে ফিরে স্ত্রীদের কাছে সন্ন্যাসজীবনে-পাওয়া নানাপ্রকার শক্তির খেলা দেখাচ্ছিলেন। এতে হাড়িসিদ্ধা চটে গিয়ে গোবিন্দচন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। ফলে রাজা স্ত্রীসমাজে বড়োই অপ্রস্তুত হলেন। তখন তিনি হাড়িসিদ্ধার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীদের প্ররোচনায় তাঁকে মাটির ভিতরে পুঁতে রাখলেন। হাড়িসিদ্ধা বারো বছর সেইভাবে মাটির তলায় রইলেন। শেষে তাঁর শিষ্য কানুপা তাঁকে উদ্ধার করেন এবং রাজাকেও হাড়িসিদ্ধার ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর

রাজার সংসার-বাসনা দূর হল, তিনি রাজধর্ম ও স্ত্রীদের ছেড়ে দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরে গিয়ে সাধনা করতে লাগলেন, এতে তাঁর মা ময়নামতীও খুশি হলেন। মৌখিক কাহিনীটি— গোপীচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন—এই ধরনের গার্হস্থ্যজীবনের বর্ণনায় সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পুঁথিটিতে দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত গোবিন্দচন্দ্র (পুঁথিতে তাঁকে গোবিন্দচন্দ্রই বলা হয়েছে) সংসার ছেড়ে নাথযোগী হয়ে যান। পুঁথিটির কাহিনী নাথধর্মমতের অধিকতর অনুগামী। কারণ যোগমার্গ অবলম্বন করে সন্ন্যাসগ্রহণ এবং তার দ্বারা মোক্ষলাভই হল নাথধর্মসাধনের মূল কথা। কিন্তু কৃষকদের মুখ থেকে সংগৃহীত ছড়ায় দেখা যাচ্ছে, গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসগ্রহণের পর বাড়ি ফিরে স্ত্রীদের সমভিব্যাহারে দিব্যি সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন। গ্রাম্য লোকরুচি, যা ছড়া-পাঁচালিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা সংসার-যাত্রার পুনর্মিলন দেখতে অভ্যস্ত—রাজা গোপীচন্দ্র দীর্ঘকাল হীরানটীর কাছে বন্ধক থেকে বাড়ি ফিরে এলেন, তারপরে সুখে রাজ্যপাট চালাতে লাগলেন—সাধারণ শ্রোতা কাহিনীটিকে এইভাবে দেখেছিল।

এ কাহিনীটি মূলত লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, লোকমুখে-শ্রুত ছড়া-পাঁচালিই তার প্রমাণ। এতে শিথিল ধরনের আখ্যান জনরুচির অনুরূপ করেই বিবৃত হয়েছে, কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনার ঢঙে অশিক্ষিত মনের ছাপ পড়লেও ধর্মতত্ত্বাদি ব্যাখ্যায় এই সমস্ত বর্ণজ্ঞানহীন লোক-কবিরা বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ে মায়ের ওপর দোষারোপ, মাতৃচরিত্রে সন্দেহ, শাশুড়ির বিরুদ্ধে বধূদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ব্যাপার বেশ বাস্তবতার সঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রাক্কালে অদুনা-পদুনার বিলাপের ভাষাটি অমার্জিত হলেও আর্ত হৃদয় থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে করুণ বেদনা সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। কেউ কেউ এই সমস্ত কাহিনীর উচ্চরত সাহিত্য-মূল্য সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ এতে উল্লিখিত সমাজচিত্রগুলিকে মধ্যযুগের বাংলার যথার্থ সমাজকথা বলে এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে খুব আলোচনা করে থাকেন, কেউ-বা গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর স্থান-কাল নিয়েও নানাধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আনন্দবোধ করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অশিক্ষিত কৃষক-কবিদের মুখে মুখে রচিত এই সমস্ত তুচ্ছ ছড়া-পাঁচালিকে পুঁথিগত সাহিত্যের সমতুল্য না-ভাবাই উচিত। এতে যে সমাজচিত্র আছে, তাতে মধ্যযুগের স্থানীয় সমাজের কিছু কিছু প্রভাব থাকলেও আসলে এগুলি দূর অতীতের স্মৃতিবহ বিস্মৃত প্রায় চিত্র—তার বেশি এর দাম দেওয়া যায় না। ত্রিপুরায় মেহারে এখনও এই গানে উল্লিখিত স্থানের নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, কোনো এক সময়ে স্থানীয় কোনো অঞ্চলে এ ধরনের ঘটনা ঘটুক আর না ঘটুক, স্থানীয় কবিরা কাহিনী রচনার সময় পটভূমিকা হিসেবে নিজ নিজ অঞ্চলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত কাহিনীর পশ্চাতে ইতিহাসের 'পাথুরে প্রমাণ' আবিষ্কার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

এখন মৌখিক ছড়া-পাঁচালি ও পুঁথির পরিচয় নেওয়া যাক। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে গ্রিয়ার্সন সাহেব রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কের নিকট সর্বপ্রথম গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে দেবনাগরী হরফে ঐ বৎসরের এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি কোনো পুঁথি বা খাতা থেকে অথবা কারও মুখ থেকে এ গান সংগ্রহ করেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, তখনকার শিক্ষিত বাঙালি এ গানের কোনো খোঁজখবর করেছিলেন বলে মনে হয় না। দীনেশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬) সর্বপ্রথম সাহিত্যের ইতিহাসে এই ছড়া-পাঁচালি সম্বন্ধে অতি উপাদেয়

আলোচনা করেন। পরে এই ছড়ার প্রতি সাহিত্যানুরাগীদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত এই ছড়াগীতিকে বৌদ্ধ-প্রভাবিত মনে করে বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন—যদিও সেরকম মনে করার কোনো কারণ এ ছড়াতে নেই। নাথধর্ম বৌদ্ধধর্মের বংশাবতংস নয়, যোগমার্গীয় শৈব-ধর্মের সঙ্গেই নাথধর্মের আত্মীয়তার মেলবন্ধন ঘটেছে। যাই হোক, এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, উত্তরবঙ্গে, বিশেষত রংপুর অঞ্চলের কৃষকসমাজে এ গানের বেশ প্রচলন আছে। রংপুরের নীলফামারী মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ১৯০৭-১৯০৮ সালের দিকে গ্রিয়ার্সনের পন্থা অবলম্বন করে তিনজন যোগীভিখারির মুখ থেকে গোপীচন্দ্রের সমস্ত গানটি লিখে নিলেন। এর অনেক পরে ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে গ্রীয়ার্সন এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত গান অবলম্বনে (বোধ হয় বিশ্বেশ্বরবাবুর দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত) পালাগান মুদ্রিত হয়। ১৯২৪ সালে এই পালার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে পুঁথির পাঠ গৃহীত হয়েছিল। একটি হল ভবানীদাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালি' এবং আর একটি—সুকুর মহম্মদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ('যোগীর পুঁথি'-নামে অধিকতর পরিচিত)। বলাই বাহুল্য, প্রথম খণ্ডটি বিশুদ্ধরূপে লোকসাহিত্য এবং মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি পুঁথি-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এতে কাহিনী দুটি পুঁথি থেকেই পাওয়া গেছে, এবং পুঁথি দুটির কবির নামও জানা যাচ্ছে—ভবানী দাস ও সুকুর মহম্মদ।

অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও এই কাহিনীর মুদ্রণ প্রচারের চেষ্টা চলেছিল। বাংলা ১৩০৮ সনে শিবচন্দ্র শীল একটি পুঁথি অবলম্বনে (১৮০০ খ্রীঃ অব্দে নকল-করা) 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' সম্পাদিত করে প্রকাশ করেন। কাব্যটির রচনাকারের নাম দুর্লভ মল্লিক। ইতি সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। কাহিনীটি বেশ সংহত, রচনাও মার্জিত। তা হলে দেখা যাচ্ছে যুগী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক ছড়া-পাঁচালির প্রভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিও এ কাহিনীতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এই কাব্যের কাহিনীর শেষে আছে, গোবিন্দচন্দ্র (অর্থাৎ ছড়া-পাঁচালির গোপীচন্দ্র) সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। কবি যে যোগীসিদ্ধাদের তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন—তার প্রমাণ, এতে অনেকটা জায়গা জুড়ে সাধন-তত্ত্বের বর্ণনা আছে। হয়তো স্বয়ং কবি নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অতটা ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কাব্যটির বিশেষ কোনো সাহিত্য গুণ নেই। সম্পাদক সে যুগে অল্পস্বল্প ইতিহাস ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' বৌদ্ধ প্রভাব আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এর পশ্চাতে অনেক ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। অবশ্য শীল মহাশয়ের অনেক মন্তব্য পরবর্তী যুগের নতুন আবিষ্কারের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর অতন্দ্র ও একনিষ্ঠ গবেষণা এখনও প্রশংসা দাবি করতে পারে।

বাংলা ১৩২১ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' প্রকাশিত হয়। মনে হয়, লোকমুখে প্রচলিত ছড়া-পাঁচালি অবলম্বনে ভবানীদাস নামে কোনো কবি ময়নামতীর গান বেঁধেছিলেন। অবশ্য এ পুঁথি সত্যই ভবানীদাসের কি না তাতে সন্দেহ আছে। কারণ এর ভণিতা সম্বন্ধে কয়েকজন সমালোচক সন্দেহ তুলেছেন। এতে বহু ইসলামি শব্দ আছে। মনে হয় এতে মুসলমান কবিও বেশ হাত চালিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গানের' দ্বিতীয় খণ্ডেও

ভবানীদাসের আর-এক পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে। ভবানীদাসের ভণিতায় অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে। সুতরাং তার অস্তিত্বে সন্দেহ করা ঠিক হবে না। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাংলা ১৩৩২ সালে আবদুল সুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নামে আর একখানি পুঁথি প্রকাশ করেছিলেন। সুকুর মহম্মদের এইখানি যথার্থ পুঁথি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গোপীচন্দ্রের গানের' দ্বিতীয় খণ্ডে সুকুর মহম্মদের যে কাব্য ছাপা হয়েছে, তা বটতলায় ছাপা গ্রন্থের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। তাই তার চেয়ে ভট্টশালী-সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' অনেক বেশি প্রামাণিক। যাই হোক, গোপীচন্দ্রের কাহিনীসংক্রান্ত ছড়া-পাঁচালি ও পুঁথিপত্র থেকে মনে হচ্ছে, নাথ-ধর্মাবলম্বী যুগীসম্প্রদায়ের (এখনও এ সম্প্রদায় আছে) ধর্ম, আচার এবং গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ে অনেক ছড়া-পাঁচালি লোকের মুখেমুখে ফিরত, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে অনেক কবি এই ধরনের অনেকগুলি কাহিনী লিখেছিলেন। তার কিছু কিছু আমাদের যুগেও এসে পৌঁছেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কৌতূহলজনক উপাদানের কথা বলি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে এটির সংবাদ জানা গেছে। নেপালে প্রাপ্ত নেপালি গদ্যে রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক' পাওয়া গেছে, রচনাকাল ১৬২০-৫৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে। এটি নেপালি ভাষায় রচিত হলেও এর গানগুলি কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা। এই গান থেকে জানা যাচ্ছে গোপীচন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে তাঁর অন্তঃপুরে বেশ একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলে ঘোষিত হলেও এর ভাষা হাল আমলের মতো।

নাথধর্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত যেমন কতকগুলি আখ্যানকাব্য ও ছড়া-পাঁচালি রচিত হয়েছিল, তেমনি আবার বিশুদ্ধ তত্ত্বদর্শন-সংক্রান্ত কতকগুলি ছড়াপদও পাওয়া গেছে, যাতে কোনো কাহিনী নেই, শুধু সাধনভজনের গূঢ় ইঙ্গিতে পূর্ণ পদ বা বিচ্ছিন্ন পংক্তি আছে। এছাড়াও ড. পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়ে'র পরিশিষ্টে এই ধরনের নাথ সাধনভজনকেন্দ্রিক কতকগুলি ছড়া মুদ্রিত করেছেন। তিনি এই রকম চারখানি পুঁথি পেয়েছেন—'যোগীর গান', 'যুগীকাচ', 'গোর্খসংহিতা', 'যোগ-চিন্তামণি'। এই সমস্ত গীতসংগ্রহে দেহকে অমর করবার কৌশল, হঠযোগ, তন্ত্র ইত্যাদি নানা নাথ যোগতত্ত্ব রূপকের ছলে বিবৃত হয়েছে। এঁদের কেউ কেউ যোগরহস্য ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণের রূপকও গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিলেন। তাঁরা হিন্দুর যোগদর্শন গ্রহণ করলেও মাঝে মাঝে ইসলামি সাধনার শব্দাদিও ব্যবহার করেছেন। এই গান ও ছড়াগুলি গুহ্য সাধনা-ভজনের ইঙ্গিতবাহী, নাথ-সম্প্রদায়ের বাইরে এর চল নেই—অবশ্য এখনও এগুলি যুগী-সম্প্রদায়ের মধ্যে গীত হয়, যুগী-ভিখারিরা এই গান গেয়ে ভিক্ষা করে থাকে। তবে এগুলির কাব্যগুণ নিতান্তই ক্ষীণ, সুতরাং এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। শৈব নাথধর্ম হাজার-দেড়হাজার বছর ধরে সমগ্র ভারতবর্ষেই চলেছে, এবং এখনও জীবিত আছে। এঁদের প্রচারমূলক সাহিত্যও আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে এখানে এঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।